Vol. 50 | No. 2-3 | 2013

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

'আধুনিক' বাংলা কাব্যধারায় নজরুলের স্থান-বিচার

Volume	50
Issue	2-3
Year	2013
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Mohammad Azam
Published online	June 1, 2013
DOI	10.62328/sp.v50i2-3.2
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v50i2-3.2
Pages	৪৩-৫৮
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

'আধুনিক' বাংলা কাব্যধারায় নজরুলের স্থান-বিচার

Check for updates

মোহাম্মদ আজম*

ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পর ঔপনিবেশিক বাস্তবতায় কলকাতায় বাংলা কবিতার যে নতুন ফলন দেখি, এ লেখায় তাকেই আমরা 'আধুনিক বাংলা কবিতা' বলব। বাংলা সমালোচনা সাহিত্যে এই অর্থে 'আধুনিক' শব্দটির ব্যাপক ব্যবহার দেখি। তিরিশের কবিরা এবং পরবর্তী সমালোচকেরা তিরিশ-পরবর্তী কবিতার পরিচয়সূত্রে 'আধুনিক' শব্দটি অপরিবর্তিত অবস্থায় ব্যবহার করে যে গোলমাল পাকিয়েছেন, তাকে আমরা এখানে গ্রাহ্য করব না। প্রধানত ঔপনিবেশিক হীনম্মন্যতার কারণেই 'আধুনিক' শব্দটির প্রতি বাংলাভাষীদের প্রবল ভক্তিভাব দেখা যায়। পশ্চিমদেশীয় ভাব ও রূপকে 'আধুনিক' আখ্যা দিয়ে বাদবাকি অনেক কিছুকে 'অনাধুনিক' বা 'মধ্যযুগীয়' কোটায় ফেলতে পারলে চিন্তার যে সরল-একরৈখিক কাঠামো তৈরি হয়, তার আরামে আমাদের অধিকাংশ লেখককে সাহিত্যচর্চা করতে দেখি। এ লেখায় আমরা সারল্যের এই আরামকে প্রশ্রয় দেব না। সার্বিক মানব-'প্রগতি'র নানা অংশে আধুনিক জমানার বিস্তর অবদান — যেমন, পশ্চিমা অর্থে জাতীয়তাবাদী চৈতনা, বা মার্কসীয় অর্থে সাম্যবাদী চেতনা — নিশ্চয়ই স্মরণীয়; কিন্তু ভুলে যাওয়ার উপায় নাই — উপনিবেশবাদী, সাম্রাজ্যবাদী শাসন-শোষণ আর অসম ক্ষমতা-সম্পর্কের আরো দশ দিগন্ত এই আধুনিক জমানার 'আধুনিকতা'র প্রকল্পেরই অংশ।

এই লেখায় আমরা অবশ্য এসব পরিভাষা বা সংজ্ঞার অর্থ বিশদায়িত করতে তৎপর হব না। আমরা মূলত কবি নজরুলকে ইতিহাসের পাটাতনের মধ্যে স্থাপন করে এই কবির তুল্যমূল্য পুনর্নির্মাণে সচেষ্ট থাকব। এক্ষেত্রে নন্দনতত্ত্বের রাজনীতি ও রাজনৈতিকতার ইতিহাসে তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হবে; আর মনে রাখতে হবে, খোদ ইতিহাসই নির্মাণ-পুনর্নির্মাণের এক অন্তহীন খেলা।

১

নজরুল বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সম্ভবত সবচেয়ে বিতর্কিত কবি। কবি হিসাবে তাঁর সক্রিয়তার কালেও এটা সত্য ছিল, আর স্তব্ধতার পরে আরো বেশি সত্য। মূল্যায়নের এত বিচিত্র রূপ, এত বিরোধ, প্রশংসা-অবহেলার যুগল তীব্রতা সম্ভবত আর কোনো বাঙালি কবিকে এতটা অনিশ্চিত করে তোলেনি।

ঐতিহাসিকভাবে নজরুলের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি রবীন্দ্রনাথের সাথে যুগলরূপে উচ্চারিত হওয়া। তাঁকে হরহামেশাই বাঙালি মুসলিম জাগরণের অগ্রদূত হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। তাঁর সমকালেই অনেকে তাঁকে অভিহিত করেছেন 'যুগমানব' অভিধায়। কিন্তু একটু মনোযোগ দিলেই বোঝা যাবে, উপরে বলা তিনটি ক্ষেত্রেই খানিকটা সম্প্রদায়গত

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

বিবেচনা কাজ করেছে। আর, এসব মূল্যায়ন ঠিক কবি হিসাবে নয়, বরং নজরুলের সর্ববিধ কর্মকাণ্ড ও অবদানের সারাৎসার। তাছাড়া, এগুলো মোটের উপর আমজনতার উচ্চারিত-অনুচ্চারিত অভিব্যক্তি — প্রাতিষ্ঠানিক কেতায় উৎপাদিত বিশেষজ্ঞ-মন্তব্য নয়।

আমজনতার অভিব্যক্তি আর বিশেষজ্ঞজনের প্রাজ্ঞমতের মধ্যে কোনটি গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষত এই ঔপনিবেশিক অভিজ্ঞতার দেশে, যেখানে ছোট্ট উচ্চকোটির সাথে বিপুল গণমানুষের মানসিক-মাননিক ফারাক বিরাট — সে সম্পর্কে আমরা এখানে কোনো সিদ্ধান্ত নিচ্ছি না। আর ব্যক্তির অন্যসব কর্মকাণ্ড থেকে তার কবিতা কিভাবে কতটা পৃথক — সে সম্পর্কেও আমরা নিশ্চিত নই। কিন্তু এখানে আমরা নিরত থাকতে চাই কাব্যধারা ও কাব্য-বিবেচনার ধারার মধ্যে। সেদিক থেকে দেখলে কবি হিসাবে নজরুলের সর্বোচ্চ মর্যাদা প্রকাশিত হতে দেখি এ মতের মধ্যে যে, বাংলা ভাষার প্রধান কবি চারজন — মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম ও জীবনানন্দ দাশ।

বলা দরকার, বাংলা কবিতার ইতিহাস ও সমালোচনা সাহিত্যের প্রভাবশালী বলয়ে এ মতের কোনো প্রতিফলন পাওয়া যায় না। আমাদের বিদ্যায়তনিক সমালোচনায় নজরুলকে সাধারণত স্থাপন করা হয় রবীন্দ্রনাথ ও তিরিশি কবিদের মধ্যবর্তী পাটাতনে। তাঁর সাথে এক কাতারে নাম উচ্চারিত হয় সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মোহিতলাল মজুমদার ও যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের। কিন্তু অসংখ্য নমুনা দিয়ে দেখানো যাবে যে, খুব কম ক্ষেত্রেই নজরুল, এমনকি এই সংকীর্ণ সীমার মধ্যেও, 'যথার্থ' মর্যাদা পান। সুকুমার সেন, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, শশিভূষণ দাশগুপ্ত, দীপ্তি ত্রিপাঠী, অশ্রুকুমার সিকদার প্রমুখের প্রভাবশালী সব গ্রন্থে নজরুল খুব গৌণভাবে উপস্থিত থেকেছেন।

তিরিশের কবিদের মধ্যে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে এবং অমিয় চক্রবর্তী নজরুল সম্পর্কে যথাসম্ভব নিঃশব্দ ছিলেন; সতর্ক উচ্ছ্বাস দেখিয়েছেন বুদ্ধদেব বসু ও জীবনানন্দ দাশ। এই দুই 'বাঙাল' কবির উপর নজরুলের কবিতার প্রভাব পড়েছিল, এবং, অন্তত বুদ্ধদেব বসুর ক্ষেত্রে, সম্ভবত জীবনেরও — এই তথ্যে ইতিহাসের কোনো সূত্র লুকিয়ে থাকা অসম্ভব নয়।

২

প্রাথমিকভাবে নজরুল-সম্পর্কিত উন্নাসিকতা ও উচ্ছ্বাসের একটা সূত্র বাঙালি জনগোষ্ঠীর সম্প্রদায়গত দ্বি-ধারার মধ্যে পাওয়া যাবে। এবং সে সূত্র অদরকারিও নয়। কেননা, বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসের সাথে এর নিগূঢ় যোগ বিদ্যমান। কিন্তু সে প্রসঙ্গে না গিয়ে যদি শুধু নন্দনতাত্ত্বিক বিবেচনায় সীমিত থাকতে চাই, তাহলে মোটা দাগে অন্তত দুটি ক্ষেত্রে আমাদের দৃষ্টি দেয়া জরুরি, যেগুলো আমাদের মতে নজরুল-বিবেচনায় দ্বিধার মূল উৎস। একটি হল : উপনিবেশ-আমলে কলকাতার জনজীবন, রাজনীতির গতি-প্রকৃতি, জীবনবোধ ইত্যাদি থেকে উদ্ভূত নন্দনতত্ত্ব; অন্যটি হল : তিরিশি 'আধুনিকতা'র শিল্পভাবনা ও জীবনবোধের গভীর-ব্যাপক বিস্তার। এ দুটি যে পরস্পরের বিরোধী তা নয়; তবে প্রধানত শিল্পভাবনার ক্ষেত্রে কয়েকটি নতুন প্রস্তাব এবং উত্তরকালীন সাহিত্যচর্চায় বিপুল প্রভাব দ্বিতীয়টিকে স্বতন্ত্র বৈধতা দিয়েছে।

কলকাতায় উপনিবেশায়ন প্রক্রিয়া উনিশ শতকের গোড়াতেই নানা দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপ লাভ করছিল। কিন্তু ওই শতকের দ্বিতীয়ার্ধেই ইংরেজি শিক্ষিত আর ইংরেজ শাসনের সহায়ক বাঙালি জনগোষ্ঠীর মধ্যে তৈরি হয় গভীরতর অর্থে 'ঔপনিবেশিক মন'। পুরানা আচার, দৃষ্টি, ভাষা, মূল্যবোধ, নৈতিকতা ইত্যাদির খোল-নলচে পাল্টে গিয়ে আবির্ভূত হতে থাকে নতুন সব ধারণা, পরিবর্তিত সব কাঠামো — নয়া জমানার নয়া মানুষ (চ্যাটার্জি ১৯৯৩, নন্দী ১৯৮৯, চৌধুরী ১৪০৬, ১৪০৮ ইত্যাদি)। বাঙালির উল্লেখযোগ্য রচনার একটা বড় অংশ এই পরিবর্তনের মহিমাকীর্তনে মুখর। আমরা এখানে শুধু নীরদচন্দ্র চৌধুরীর দুটি বইয়ের উল্লেখ করব — *আত্মঘাতী বাঙালী* ও *বাঙালী জীবনে রমণী* — যে দুটো বই খুব সূক্ষ্ম ও গভীর স্তরে পরিবর্তনের ইঙ্গিতগুলো খুলে খুলে দেখিয়েছে। সেখানে দেখা যায়, কিভাবে কলকাতা নতুন সংস্কৃতির ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের লীলাক্ষেত্র হয়ে উঠছে; আর খুব সীমিত পরিমাণে হলেও সেই সংস্কৃতির রেশ এমনকি 'বাঙাল'দেশের ময়মনসিংহ পর্যন্ত পৌঁছে যাচ্ছে। নীরদ চৌধুরী প্রধানত বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথকে উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন, যে পরিবর্তন সমাজে সূচিত হয়েছিল, তারই প্রতিফলন ঘটেছে সমকালীন সাহিত্যে।

উনিশ শতকে ইংরেজ-প্রশ্রয়ে আমাদের যে আধুনিকতার জন্ম, তার চরিত্র বিচার করে দেবেশ রায় প্রস্তাব করেছেন তাঁর বিখ্যাত দুই আধুনিকতার তত্ত্ব (রায় ১৯৯১)। তাঁর মতে, ঈশ্বর গুপ্ত ও প্যারীচাঁদ মিত্রের যে 'আধুনিকতা' আর মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্রের যে 'আধুনিকতা' — এ দুটি একই আধুনিকতার স্তরান্তর নয়। মধুসূদন ও বঙ্কিমের আরম্ভটা ছিল 'সম্পূর্ণই এক নতুন আরম্ভ'। ঈশ্বর গুপ্ত ও প্যারীচাঁদ মিত্রও সেই জনগোষ্ঠীর লেখক, যে গোষ্ঠীটি ইংরেজ শাসনের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে কলকাতায় গড়ে উঠেছিল। কিন্তু শতাব্দীর শেষাংশে এই জনগোষ্ঠীর রূপান্তরিত গড়নটা ছিল অনেক বেশি পরিণত ও সুস্পষ্ট অবয়বপ্রাপ্ত। বাঙালির এই পরিবর্তিত মন-মেজাজ-রুচিকে বরাভয় দিতেই আবির্ভূত হলেন মাইকেল মদুসূদন দত্ত কিংবা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

কী ছিল এই নতুন মানুষদের বৈশিষ্ট্য?

প্রথমত, এ ছিল ছোট্ট এক জনগোষ্ঠী, বিপুল বাঙালি-অবাঙালি জনতার সাথে যার দূরত্ব ছিল অসীম। দ্বিতীয়ত, এঁরা সবাই হিন্দু কলেজ এবং তার ধারাবাহিকতায় প্রতিষ্ঠিত ইংরেজি বিদ্যায়তনের ফসল; তৃতীয়ত, শ্রেণির দিক থেকে এঁরা কলকাতার এলিট উচ্চশ্রেণিভুক্ত — চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত-উদ্ভূত নতুন শ্রেণির সার্বিক পৃষ্ঠপোষকতায় নির্মিত ও পালিত; চতুর্থত, ধর্মের দিক থেকে এঁরা উচ্চশ্রেণির হিন্দু, যে উচ্চশ্রেণিটি পুরানা ভারতের ধর্মীয় উচ্চশ্রেণি নয়, বরং ব্রাহ্মধর্মের মতো একটি ইউরো-খ্রিস্টীয় ধারার ছত্রছায়ায় বিকশিত নতুন গোষ্ঠী; পঞ্চমত, সংস্কৃতি ও জীবনবোধের দিক থেকে এই শ্রেণিটি পুরোপুরি মেট্রোপলিশ কলকাতার, বাইরে লন্ডনের সঙ্গেই ছিল তাদের নাড়ির যোগ, গ্রামীণ বা কৃষক-চৈতন্যের সাথে নয়। এর বাইরে এই ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে আরেকটি বড় প্রবণতা শনাক্ত করা যায়, যাকে বলতে পারি হিন্দু জাতীয়তাবাদী চেতনা। আপাতদৃষ্টিতে এই উপাদানটিকে স্থানীয় মনে হতে পরে; কিন্তু পার্থ চট্টোপাধ্যায় (চ্যাটার্জি ১৯৯৩) কিংবা আশিস নন্দীর (নন্দী ১৯৮৯) মতো সাম্প্রতিক বহু বিশ্লেষক দেখিয়েছেন, এই জাতীয়তাবাদী চেতনা গভীরভাবে উপনিবেশায়ন প্রক্রিয়ারই ফল, এর বাইরের কিছু নয়।

উনিশ শতকের শেষার্ধ এবং বিশ শতকের প্রথমাংশে কলকাতাকেন্দ্রিক বাঙালির জীবনচর্যা ও মননচর্চার ইতিবৃত্ত উপরের বৈশিষ্ট্যগুলো দিয়ে চেনা যাবে বলেই আমাদের ধারণা। এই পরিপ্রেক্ষিতের মধ্যে যদি স্থাপন করতে চাই নজরুলকে, তাহলে এমন কোনো শর্ত বা সূত্র কি পাওয়া যায়, যা একই ধারাবাহিকতায় রেখে নজরুলের জীবন ও সাহিত্যকর্ম বুঝতে আমাদের সাহায্য করে? জীবনের ক্ষেত্রে তো পাওয়া যায়ই না। চুরুলিয়ার এক নিঃস্ব দরিদ্র মুসলমান পরিবারে জন্ম নেয়া এই কবি সব দিক থেকেই রবীন্দ্রনাথ-বর্ণিত 'মাটির কাছাকাছি' স্তরের মানুষ। একেবারে মৃত্তিকা-সংলগ্ন 'স্টক' থেকে উঠে আসা ভূমিজ পুরুষ। পরবর্তীকালে কলকাতায় গ্রামোফোন কোম্পানির বদৌলতে কিছু সময়ের জন্য সচ্ছল জীবনযাপন করলেও ধর্ম-বর্ণ-পেশা-শিক্ষা-রুচি — কোনো দিক থেকেই নজরুল কলকাতার এলিট দলভুক্ত হতে পারেননি। তাঁকে স্নেহ করেছেন অনেকে; বিশেষত রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় ভাবুকেরা তাঁর মধ্যে বিপুল সম্ভাবনা আবিষ্কার করে বাহবা দিয়েছেন; কিন্তু কলকাতার সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক কোনো প্রভাবশালী গোষ্ঠীতে নজরুল থিতু হননি বা হতে পারেননি।

আর তাঁর সাহিত্যকর্ম? হুমায়ুন কবির নজরুল-সাহিত্যের অন্তর্নিহিত প্রেরণা বিশ্লেষণ করেছেন এভাবে : এক. নজরুল অসহযোগ আন্দোলনের কবি; দুই. পুরানা পুঁথিসাহিত্যের ঐতিহ্যের মধ্যেই নজরুলের বিকাশ; তিন. বাংলার বিপুল কৃষক সম্প্রদায়ের সাথে তাঁর সহজ আত্মীয়তা (কবির ২০০২)। হুমায়ুন কবিরের এই শনাক্তি যদি আংশিকভাবেও মেনে নিই, তাহলে বলতেই হয় : 'আধুনিক' বাংলা কাব্যের মূল চেতনার সাথে নজরুল-কাব্যের কোনো মিল নেই।

আমাদের প্রথম সিদ্ধান্ত : এই অমিলই বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যে নজরুলের স্থান নির্ধারণের প্রধান সংকট। উনিশ শতকের শেষাংশ থেকে শুরু হয়ে বিশ শতকের প্রথমাংশ পর্যন্ত বাংলা সমালোচনার ভাব-ভাষা ও মূল্যমান নির্ধারিত হয়েছিল কলকাতার পূর্বোল্লিখিত জনগোষ্ঠীর ভাববলয়ের সীমার মধ্যেই। সংগত কারণেই সেই ভাব-ভাষা-মূল্যমানে নজরুলের স্থান সংকীর্ণ হতে বাধ্য।

তার মানে এই নয় যে, নজরুল 'আধুনিক' বাংলা কাব্যে এক বিচ্ছিন্ন ঘটনা। মোটেই তা নয়। বরং 'আধুনিক' বাংলা কবিতার প্রচলিত ধারার সাথে সাযুজ্য রক্ষা করেই নজরুল তাঁর কবিভাষা তৈরি করে নিয়েছিলেন। মূলত রবীন্দ্রনাথের কল্যাণেই তা সম্ভবপর হয়েছিল। অসাধারণ প্রতিভাবলে রবীন্দ্রনাথ ইউরোপীয় বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের পোশাকে ভারতীয় ঐতিহ্যকে ভাষা দিতে পেরেছিলেন। তাঁর কাব্যে ঘটেছিল একধরনের সেক্যুলারায়ন (secularization) ও নিধর্মীকরণ (detheolization), যা ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে অনেকের জন্য তৈরি করেছিল প্রয়োজনীয় পরিসর। যদিও নজরুল-রচনার একটা বড় অংশ রবীন্দ্রবলয়ের সাথে সাযুজ্যপূর্ণ নয়, তবুও রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রভাব ও পৃষ্ঠপোষকতায় বিকশিত সমালোচনার ভাষা এবং নন্দনতত্ত্বে নজরুল অচেনা গণ্য হননি। সমকালীন ও উত্তরকালীন বহু সমালোচক এক ধরনের ধারাবাহিকতার মধ্যেই নজরুলকে পাঠ করেছেন, করতে পেরেছেন।

এই ধারাবাহিকতায় দুরপনেয় ছেদ তৈরি করল তিরিশি আধুনিকতা[১]। নজরুল-সাহিত্য সম্পর্কে স্বাধীন বিবেচনার সম্ভাব্য সূত্রগুলো জমে ওঠার আগেই শুরু হল কল্লোল-কালিকলম-প্রগতি-কবিতাকেন্দ্রিক নতুন সমালোচনা ও সাহিত্যতত্ত্বের বিপুল সম্ভার। এই পণ্ডিত কবিদের সক্রিয়তা আধুনিকতাবাদী সাহিত্যতত্ত্বের কিছু ধারণা এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়েছিল যে, বিশ শতক শেষ হয়ে গেলেও তার প্রভাব-প্রতিপত্তি বিশেষ ক্ষুণ্ন হয়নি। তিরিশি আধুনিকতার নন্দনসূত্রগুলো ভালো না মন্দ — সে বিচারে আমরা এখানে প্রবৃত্ত হব না। কিংবা, পরবর্তী কবিদের — যেমন, সুভাষ মুখোপাধ্যায় বা সুকান্ত ভট্টাচার্য, অথবা শামসুর রাহমান বা আল মাহমুদের — কবিতা পড়ার জন্য এ সূত্রগুলো কার্যকর কি না সে প্রশ্নও এখানে তুলব না। শুধু বলব, বাংলা কাব্য-সমালোচনার জগতে, এবং এমনকি কাব্যজগতেও, তিরিশি আধুনিকতা কল্পনাতীত প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছে। আর, এই আধুনিকতার সূত্রগুলো নজরুলের সাহিত্যকর্মের সাথে একেবারেই খাপ না খাওয়ায় বাংলা কাব্য-সমালোচনার ধারায় নজরুলের জন্য যথার্থ পরিসর তৈরি হয়নি।

'আধুনিক' বাংলা কবিতার প্রভাবশালী ইতিহাসকারদের যে কারো রচনা পরীক্ষা করলেই আমরা এ সত্য উপলব্ধি করতে পারব। রবীন্দ্রসাহিত্যের আলোচনার পর তিরিশের কবিতাই তাঁদের আলোচ্য — মধ্যবর্তী সংযোজক হিসাবে আলোচিত হয় নজরুলসমেত অন্য তিন কবি। আবার দৃষ্টি প্রধানত তিরিশের কবিদের দিকেই নিবদ্ধ থাকে বলে তাঁদের মধ্যে গুরুতর হয়ে ওঠেন যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। কারণ, তাঁর মধ্যেই হতাশা ও বিষণ্ণতার একটা আগাম পরিচয় পাওয়া যায়। এ এক চরম সীমাবদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি। যেনবা, কোনো সাহিত্যে একরৈখিক ধারাবাহিকতাই কেবল লভ্য! যেনবা, নন্দনতত্ত্বের প্রভাবশালী সূত্রই কেবল আলোচ্য!

পূর্ববর্তী কাব্যধারার সাথে তিরিশি কাব্য ও কাব্যতত্ত্বের ছেদ আপাতদৃষ্টিতে যতটা চরম ও পরম মনে হয়, আদতে কিন্তু অতটা নয়। সত্যি বলতে কি, উনিশ শতকের কলকাতা-নিবাসী যে ছোট্ট গোষ্ঠীর কুলজি আমরা আগে পেশ করেছি, তিরিশি কবিদের কুল-মান তা থেকে আলাদা কিছু নয়। ফারাকের মধ্যে এই, উনিশ শতকে এ জনগোষ্ঠী ছিল আশাবাদী, বর্ধিষ্ণু এবং ইতিবাচক প্রাণবানতায় চঞ্চল; আর বিশ শতকের তৃতীয় দশকে তারা হয়ে ওঠে হতাশ, ক্ষয়িষ্ণু আর নেতিবাদী (কবির ২০০২)। এই কারণেই দেখা যাবে, রবীন্দ্র-সাহিত্যের আমূল বিরোধিতার এক বহুকথিত ডিসকোর্সের মধ্যে কলকাতা-নিবাসী তিরিশি কবিদের সাথে রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা ও প্রীতির সম্পর্ক শুধু অটুটই থাকেনি, গভীরভাবে দৈনন্দিনতায়ও গড়িয়েছে। তাই কোনো ছেদ অনিবার্য হয়ে ওঠেনি; এমনকি বিরোধের ছলে হলেও সম্পর্কটি অটুট ছিল।

আমাদের বক্তব্য হল : পূর্ববর্তী কাব্যধারার সাথে নজরুল কেবল আংশিকভাবে সাযুজ্যপূর্ণ, কারণ, জীবনযাপন ও চৈতন্যের ফারাক ছিল প্রবল; আর পরবর্তী প্রভাবশালী কাব্যধারার সাথে নজরুল প্রায় পুরোটাই বৈযুজ্যপূর্ণ; কারণ, জীবন-চেতনা ও কাব্যকৌশলের ফারাক দুস্তর। তাই এই কাব্যধারা এবং সমালোচনার ধারায় নজরুলের স্থান নির্ধারণের সমস্যাটি মোটেই ইচ্ছাকৃত বা বানোয়াট ব্যাপার নয় — অনুসৃত নন্দনতত্ত্বের সরল-স্বাভাবিক উপজাত মাত্র।

৩

তার মানে অবশ্য এই নয় যে, নজরুল উপেক্ষিত থেকেছেন, বা তাঁকে নিয়ে আলোচনা বা লেখালেখির পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় কম। মোটেই তা নয়। নজরুলকে নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে গ্রন্থের পর গ্রন্থ; ব্যাপকভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে তাঁর জীবন ও সাহিত্যকর্মের বিচিত্র প্রান্ত। এ সব প্রকাশনা ও বিশ্লেষণের একটা অংশ সম্প্রদায়-বুদ্ধি তাড়িত। একটা অংশ রাষ্ট্রীয় ও প্রাতিষ্ঠানিক আনুকূল্যপুষ্ট। এগুলোও মূল্যবান; কারণ, এগুলো ধারণ করে আমাদের জনচৈতন্য, সাংস্কৃতিক চেতনার অবস্থা ও মান। সুখের বিষয়, নজরুল-চর্চার একটা বড় অংশ খুব সাহিত্যিক অর্থেই মূল্যবান। এই মূল্যবান রচনাদির একটা গুরু-অংশকেও আমরা বর্তমান বিবেচনা থেকে বাইরে রাখতে চাই, যে অংশটা আগ-পরের সাহিত্যিক ধারাবাহিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে নজরুল-রচনাবলির বিশ্লেষণ করেছে। আমরা আগেই দেখিয়েছি, 'আধুনিক' বাংলা সাহিত্যের প্রভাবশালী বলয়ের সাথে খাপ খায় না বলে নজরুল-রচনার পৃথক মূল্যায়ন জরুরি। কিন্তু এ ধারার বিশ্লেষণ এমনকি বিরোধসূত্রেও প্রভাবশালী ডিসকোর্সের সাথে যুক্ত না হওয়ায় অন্তত বাংলা কাব্যধারায় নজরুলের অবস্থান বিচারের ক্ষেত্রে বিশেষ কাজে আসে না। এখানে আমরা বরং কিছুটা পর্যালোচনা করব নজরুল-সংক্রান্ত বিশ্লেষণের ওই অংশ, যে অংশটি রবীন্দ্রনাথ ও তিরিশি কবিতার মূল অনুমানগুলো মেনে নিয়ে একটা ধারাবাহিকতার অংশ হিসাবে নজরুল পাঠ করেছে। এ ধরনের আলোচনার কয়েকটি প্রবণতা চিহ্নিত করা যাক :

> এক. সাধারণভাবে নজরুলকে চেনা হয় রোমান্টিক কবি হিসাবে। সেই রোমান্টিকতার এক পাশে বিদ্রোহ, অন্যপাশে প্রেম ও প্রকৃতি।
>
> দুই. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আর তিরিশি কবিদের মধ্যবর্তী জায়গায় তাঁর স্থান। আর এই স্থানে সত্যেন দত্ত, মোহিতলাল মজুমদার কিংবা যতীন সেনগুপ্তের তুলনায় তাঁর গুরুত্ব অনেক বেশি।
>
> তিন. বাংলা কবিতায় রবীন্দ্র-প্রভাব অতিক্রমে নজরুল খুব বড় ভূমিকা রেখেছেন 'অলস শব্দসুষমা'র বিপরীতে বীরত্বব্যঞ্জক গতি সৃষ্টির মধ্য দিয়ে।
>
> চার. নজরুল ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনের কবি এবং 'ঔপনিবেশিক সমাজে সংগ্রামী কবি'।
>
> পাঁচ. নজরুল নিম্নশ্রেণীর মানুষের প্রতি দরদি কবি-ব্যক্তিত্ব। বাংলা কবিতার সীমাকে তিনি এ দিক থেকে প্রসারিত করেছেন।
>
> ছয়. নজরুল গভীরভাবে মানবতাবাদী কবি; তাঁর সমগ্র উচ্চারণ এবং কর্মপ্রবাহ এক গভীর মানবতাবোধ দ্বারা অনুপ্রাণিত।
>
> সাত. নজরুল বাংলা কাব্যের ধারায় একজন বড় কবি। বাংলা কবিতার শব্দমুদ্রায় ও ছন্দে তাঁর সুস্পষ্ট অবদান রয়েছে। তাঁর কাব্যস্বর পৃথক ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। উত্তরকালীন কবিতার অন্তত তিনটি প্রধান ধারায় — ইন্দ্রিয়জাগর উচ্চারণে, সাম্যবাদী-মার্কসবাদী কবিতায় এবং ইসলামচেতন কবিতায় — বিপুল প্রভাব তাঁর গুরুত্বকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। (মনিরুজ্জামান ১৯৯৯, সৈয়দ ১৯৭৭, ১৯৮৭, রহমান ১৯৯৩)

এই তালিকা আরো বাড়ানো যায়। তবে, সাধারণভাবে বাংলা কাব্যধারার ধারাবাহিকতার মধ্য থেকে নজরুল-সাহিত্যকে যাঁরা ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন, তাঁদের আলোচনার প্রধান সূত্রগুলো এতে পাওয়া যাবে। সূত্রগুলো মূল্যবান; কারণ, এগুলোর

ভিত্তিতে সহজেই দেখানো সম্ভব যে, নজরুল 'আধুনিক' বাংলা কবিতার প্রধান চার কবির অন্যতম।

কিন্তু, এই সূত্রগুলো নজরুল-বিবেচনায় পুরোপুরি যথার্থ নয়, যথেষ্ট তো নয়ই। তার প্রধান কারণ, এসব সূত্রে মান্য করা হয়েছে প্রতিষ্ঠিত-প্রভাবশালী নানা ছক — একদিকে ইউরোপি নন্দনতত্ত্বের যে ছকগুলো উপনিবেশিত কলকাতায় চর্চিত হয়েছে সেসব ছক; অন্যদিকে, ঔপনিবেশিক কাঠামোর একটা সংকীর্ণ শ্রেণিভিত্তির মধ্যে জন্ম নেয়া, বিকশিত হওয়া সব নন্দনতাত্ত্বিক কাঠামো। আমি এখানে কেবল দুটি ছকের উদাহরণ দিতে চাই, যেগুলো হরহামেশাই নজরুলের ক্ষেত্রে আরোপ করা হয়, অথচ এসব ছাঁচে নজরুলকে কেবল অতি-আংশিকভাবেই ব্যাখ্যা করা সম্ভব।

প্রথমটি রোম্যান্টিকতার ছক। রোম্যান্টিক আন্দোলন বিকশিত হয়েছিল ইউরোপের এক বিশেষ আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে, যার মূল কথা হল সুদূরের আবাহন এবং রহস্যের আবেষ্টন। শেষ উনিশ শতকে কলকাতায় সংগত কারণেই এই ভাবধারা ব্যাপকভাবে প্রশ্রয় পায়। আমরা এখানে রোম্যান্টিক কাব্যতত্ত্বের গুণাগুণ নিয়ে কোনো প্রশ্ন তুলছি না। শুধু বলতে চাই, নজরুলের অতি-বাস্তবচেতন ও লিপ্ত কবিতার ধারা রোম্যান্টিক নন্দনতত্ত্বে খুব সামান্য পরিমাণেই আঁটে। তবু যে আমাদের কাব্য-বিশ্লেষকরা নজরুলকে ইংরেজ রোম্যান্টিক কবিদের সঙ্গে, বিশেষ করে শেলির সঙ্গে তুলনা করতে খুব পছন্দ করেন, তার মূল কারণ নিঃসন্দেহে 'ইউরোকেন্দ্রিকতা'। একজন সমালোচক-তাত্ত্বিক একে অভিহিত করেছেন 'ঔপনিবেশিক হীনম্মন্যতা' বলে। দেখিয়েছেন, শেলির বিদ্রোহের গতি ও গন্তব্য প্রায়শই আকাশমুখী হয়ে 'কখনো ঝুলে থাকে মেঘে, কখনো আকাশে'। আর নজরুলের 'বিদ্রোহী বীর ক্ষ্যাপা, বেপরোয়া, মুক্ত জীবনানন্দ হলেও তার 'শির' নতজানু হয় ইতিহাসের কাছেই ... তাকে বলতে হয়, আমি সেইদিন হবো শান্ত, যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল আকাশে-বাতাসে ধ্বনিবে না' (হোসেন ২০০৮)। বিস্ময়কর নয় যে, আমাদের অনেক সমালোচক এই পঙ্‌ক্তিতে এসেই শেলির বিদ্রোহের 'শিল্পশোভন' সাযুজ্য না দেখে হতাশ হয়েছেন, আর সংশয় পোষণ করেছেন খোদ 'বিদ্রোহী' কবিতার শিল্পসাফল্যে।

এরপর আসা যাক 'মানবতাবাদ' প্রসঙ্গে। সমালোচকেরা নজরুলকে সাধারণত 'মানবতাবাদী' অভিধায় চিনতে পছন্দ করেন। যেমন, কবি আবুল হোসেন একবার লিখেছেন : 'নজরুল ইসলামকে যদি এককথায় কোথাও দাঁড় করাতে হয়, তাহলে তাঁকে দাঁড় করাতে হবে হিউম্যানিজমের ভিত্তিতে। নজরুল ইসলাম হিউম্যানিজমের কবি, মানবতার কবি।' (হোসেন ১৯৯৫)

এই দৃষ্টিভঙ্গি নজরুলের ক্ষেত্রে অত্যন্ত জনপ্রিয়। নজরুল-রচনাবলি থেকে তাঁকে 'মানবতাবাদী' হিসাবে দেখানো বেশ সহজ। কিন্তু, মনে রাখা দরকার, 'হিউম্যানিজম' পশ্চিমের বিশেষ ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে জন্ম নেয়া এক দার্শনিক প্রকল্প, যা খোদ পশ্চিমেই আজ নানামুখী প্রশ্নে বিচলিত। সে প্রসঙ্গে না গিয়েও প্রশ্ন তোলা দরকার, নজরুলের 'মানবতাবাদ' পশ্চিমা 'লিবারেল হিউম্যানিজমে'র সাথে সংগতিপূর্ণ কি না।

নজরুল-সাহিত্যে যাঁদের নাম উচ্চমহিমায় প্রচারিত, যেমন, লেনিন, কালাপাহাড়, মুসোলিনি, সানইয়াৎ সেন, তাঁদের একজনও পশ্চিমা অর্থে 'হিউম্যানিস্ট' গোত্রভুক্ত নন। তাছাড়া, নজরুল ঘোষিতভাবে বিপ্লব-বিদ্রোহ-হত্যা-ধ্বংসের পয়গম্বর। এসব ধারণা তো ঘোরতরভাবে 'লিবারেল হিউম্যানিজমে'র বিরোধী। তাহলে নতুন সংজ্ঞা তৈরি না করে নজরুল প্রসঙ্গে 'মানবতাবাদী' শব্দটি ব্যবহার করলে আলোচনা জমে ওঠে বটে, কিন্তু কার্যকর কিছু হয় না।

এ তো গেল একদিক। অন্যদিকও আছে। নজরুল সম্পর্কে সাহিত্যের মাঠে যে সব নেতিবাচক মত জাহির আছে, সেগুলোর বিরোধিতা করেছেন কেউ কেউ। এই বিরোধিতার একটি প্রকট সীমাবদ্ধতার দিকে আমরা এখন নজর দিতে চাই।

নজরুলের কবিতার 'সীমাবদ্ধতা' সম্পর্কে প্রচলিত মতগুলো নিম্নরূপ :

এক. নজরুল মূলত 'টপিক্যাল' কবি। তাঁর অধিকাংশ রচনাই সমসাময়িক উত্তেজনার ফল।

দুই. নজরুলের কাব্যপ্রয়াস বিবর্তনহীন।

তিন. তাঁর কবিতার বিষয় ও আঙ্গিক পরিকল্পিত ও সুশৃঙ্খল নয়।

চার. মহৎ ও গভীর ভাব নজরুলে নাই, বা থাকলেও খুবই কম। তাই কালোত্তরে টিকে থাকার মতো রচনা নজরুল-সাহিত্যে অতি সামান্য।

পাঁচ. নজরুল মূলত ছন্দোবদ্ধ পদ্যের কবি।

এসব মত খণ্ডন করেছেন কেউ কেউ। যেমন, আবদুল মান্নান সৈয়দ বিশদভাবে দেখিয়েছেন, নজরুল একই সাথে কালজ এবং কালোত্তর (সৈয়দ ১৯৭৭, ১৯৮৭)। 'যুগের হুযুগ' কেটে যাওয়ার পরও বহুভাবে নজরুলের কবিতা ব্যবহৃত-চর্চিত-গ্রাহ্য হওয়ার প্রেক্ষাপটে বলা সম্ভব যে, নজরুল সমকালের কবি তো বটেই, একই সাথে অনাগত কালেরও কবি।

মুশকিল হল, নজরুল-রচনার 'সীমাবদ্ধতা'কে উচ্চকিত-করা পক্ষ আর এর বিরোধী পক্ষ — এই দুই পক্ষ একই নন্দনসূত্রকে ভিত্তি হিসাবে ব্যবহার করে থাকেন। কিন্তু, আমরা আগেই বলেছি, সামগ্রিকভাবে কলকাতার 'আধুনিক' কাব্য-সমালোচনার ধারায় নজরুল খুব সামান্যই খাপ খায়। জীবনানন্দ দাশ যখন বলেন, 'তাঁর কবিতা চমৎকার, কিন্তু মানোত্তীর্ণ নয়' (ইসলাম ১৩৯০ : ২১৪), তখন এক বিশেষ কাব্যরুচি আর নন্দনসূত্রেই তাঁর কথা বৈধ হয়। সেই রুচি ও নন্দনসূত্রকে চ্যালেঞ্জ না করে শুধু কথাটির বিরোধিতা করলে কার্যকর কিছু পাওয়া সম্ভব নয়। বাংলা সমালোচনায় আজো এই সংবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়নি যে, মধ্যবিত্তের জনবিচ্ছিন্ন রুচির বাইরে উৎকৃষ্ট কবিতা চেনার বহু নন্দনসূত্র বিশ্বব্যাপী প্রচলিত আছে। এই প্রশ্ন জোরালোভাবে হাজির হয়নি : কেন সমসাময়িক ঘটনা-নির্ভরতা কালোত্তীর্ণ কবিতার জন্ম দেবে না। কিংবা, কেন ছন্দোবদ্ধ পদ্য উৎকৃষ্ট শিল্প নয় — এই প্রশ্ন আজো অপেক্ষিত। ফলে নজরুলকে কেন্দ্র করে একটি নতুন সাহিত্যতত্ত্ব দানা বাঁধার সম্ভাবনা ক্ষণিকের আভাসেই অস্তমিত হয়েছে, পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণে রূপ লাভ করেনি। যদিও নজরুলের মধ্যে সেই সম্ভাবনা পূর্ণ মাত্রায় ছিল এবং আছে।

৪

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক-চরিত্র এবং ব্যক্তি-চরিত্রের দুটি মাত্রা এরকম — একদিকে উনিশ শতকের নবজাগরণপ্রসূত ইউরোপ-প্রভাবিত ভদ্রলোক-সংস্কৃতির তুমুল উৎসারণ, অন্যদিকে শেষ উনিশ শতক ও বিশ শতকের গোড়ায় বিকশিত রাজনৈতিক সংস্কৃতির রূপায়ণ।

জাতীয়তাবাদী রাজনীতির প্রচণ্ড অভিঘাতেই এসময় কলকাতাকেন্দ্রী সংকীর্ণ মধ্যবিত্ত শ্রেণিটি তার সীমা প্রসারিত করার উদ্যোগ নিতে বাধ্য হয়। সেই সীমার মধ্যে আংশিকভাবে প্রবেশ করতে থাকে কৃষক-শ্রমিক-মেহনতি জনতা, মুসলমান সম্প্রদায়, হিন্দু সম্প্রদায়ের অচ্ছুত অংশগুলো। রবীন্দ্রনাথ যে লিখেছেন — 'সে কবির লাগি কান পেতে আছি', তাঁর সে আকাঙ্ক্ষাটি আসলে নতুন রাজনৈতিক-সামাজিক বাস্তবতারই ফসল। কিন্তু শ্রেণি-অবস্থান ও সাংস্কৃতিক বলয়ের ঐতিহাসিক মেরুকরণের কারণে তাঁর নিজের পক্ষে সেই দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হয়নি।

নানা কারণে নজরুলের পক্ষে অন্তত অংশত এই কবির দায়িত্ব পালন সম্ভবপর হয়েছে।

তাঁর জন্মই তাঁকে স্থাপন করেছে এক সুবিধাজনক পাটাতনে। কাজী বংশে জন্মালেও তাঁর জন্মের সময় পরিবারটিকে গাঁয়ের আর দশটি চাষী পরিবার থেকে আলাদা করে দেখার উপায় ছিল না। পরেও কর্মসূত্রে, পত্রিকা সম্পাদনায়, সাহিত্যকর্মের বিশিষ্টতায় গণমানসের সাথে তাঁর সংযোগ খুব একটা বিচ্ছিন্ন হয়নি। উপনিবেশ-উত্তর যেসব সাহিত্যকর্মকে আমরা বাংলা সাহিত্যের মূলধারা হিসাবে সম্মান জানিয়ে আসছি, সেগুলোর রচয়িতাদের সাথে তুলনা করে দেখলে নজরুলকে এক্ষেত্রে একেবারেই বিপরীত কোটিতে পাওয়া যাবে।[২] নজরুলের সামগ্রিক বোধ-বিশ্বাস-কাব্যকলা-আগ্রহ-আবেগ-স্বপ্ন এই বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো ব্যাপার নয়। নজরুল যে একবার লিখেছিলেন, দারিদ্র্য তাঁকে মহান করেছে, তা কোনো আকস্মিক উচ্চারণ নয়, তাঁর শিল্পিসত্তার মর্মমূলস্পর্শী সত্য।

জন্মসূত্রে পাওয়া আরেকটি সত্য তাঁর অনুকূলে কাজ করেছে। তা হল, তিনি জন্মেছিলেন মুসলমান পরিবারে। 'মুসলমান' শব্দটিকে এখানে আমরা সংগত কারণেই ব্যবহার করতে চাই রাজনৈতিক বর্গ হিসাবে, আর নজরুলের সমকালের পরিপ্রেক্ষিতে শব্দটির দুটি তাৎপর্যে জোরারোপ করতে চাই। একটি হল তার শ্রেণি-তাৎপর্য, অন্যটি সাংস্কৃতিক তাৎপর্য। মুসলিম পরিবারে জন্ম নিয়ে শ্রেণির দিক থেকে নজরুল যুক্ত হয়েছেন শোষিত-বঞ্চিত এক বিশাল জনগোষ্ঠীর বাস্তবতার সাথে, আর আবশ্যিকভাবে হুমায়ুন কবির কথিত কৃষক-চৈতন্যের সাথে।[৩] অন্যদিকে, সাংস্কৃতিক তাৎপর্যের ক্ষেত্রে — যেমনটা আহমদ ছফা দেখিয়েছেন — নজরুল মুসলিম সংস্কৃতির অসংখ্য উপাদান বাংলা কবিতায় যুক্ত করে খোদ 'আধুনিক' বাংলা ভাষা ও সাহিত্য-সংস্কৃতির পরিসরটাকেই বিপুল ব্যাপকতা দিয়েছেন, আর বিপরীতক্রমে বাঙালি মুসলমানকে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির কেন্দ্রীয় আবহে যুক্ত হওয়ার সাহস যুগিয়েছেন। (ছফা ২০০০)

অন্তত আরো দুই দিক থেকে নজরুল বাংলা কাব্যধারায় একেবারেই অনন্য। একটি অসাম্প্রদায়িকতার দিক, অন্যটি ঔপনিবেশিক শাসন-বিরোধিতার দিক। ওই দুই দিকই আবার মিলেছে এক বিন্দুতে — রাজনৈতিক সক্রিয়তা ও জাতীয়তাবাদী চেতনায়। নজরুল ঠিক শ্রেণি-রাজনীতির কবি নন, যদিও সাম্যবাদী চেতনা তাঁর কবিতায় প্রবল; আবার 'নিম্নবর্গে'র কবিও নন তিনি, যদিও নিম্নশ্রেণির মানুষের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতির অনিঃশেষ প্রবাহে তাঁর কাব্যলোক মুখর। বরং এক ধরনের জাতীয়তাবাদী আকাঙ্ক্ষাই তাঁর কাব্যে প্রবলভাবে রূপায়িত হয়েছে। এই জাতীয়তাবাদ সম্ভবত ভারতীয় জাতীয়তাবাদ নয়, হয়ত বা বাঙালি জাতীয়তাবাদও নয়; বরং সকলের অংশগ্রহণে ও প্রত্যক্ষ লড়াই-সংগ্রামে এ এক গণমুক্তির অভিযাত্রা। তাঁর কবিতায় হিন্দু সংস্কৃতি ও মুসলিম সংস্কৃতির যে ব্যাপক-গভীর যৌথতা দেখি, তাকে রাজনৈতিক বাস্তবতার নিরিখেই পাঠ করতে হবে, নিছক ধর্মীয় সম্প্রীতি বা মানবতাবাদের দৃষ্টিতে নয়।

সামগ্রিকভাবে নজরুলের যে রাজনৈতিক পক্ষ ও সক্রিয়তা — গণতন্ত্রের, গণমুক্তির, স্বাধীনতার ও অসাম্প্রদায়িকতার, তার প্রত্যক্ষ প্রতিপক্ষ ঔপনিবেশিক শাসন। 'বাংলা সাহিত্যে নজরুলই বোধ করি সবচেয়ে লড়াকু উপনিবেশবাদ-বিরোধী লেখক যাকে সামান্যতম ঔপনিবেশিক হীনম্মন্যতা স্পর্শ করেনি, যার স্বার্থতাড়িত ঔপনিবেশিক টানাপড়েনের কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না।' (হোসেন ২০০৮)

যে কবি এত রাজনৈতিক, এত লিপ্ত, এত জনলগ্ন আর এত ব্যাপক, তাঁর কবিতাকে কি বিদেশ-নির্ভর উন্নাসিক মধ্যবিত্তের গণবিচ্ছিন্ন নন্দনতত্ত্বে আঁটানো সম্ভব? হওয়ার কথা নয়, হয়ও নাই।

৫

আমরা এখানে কয়েকটি সূত্র নির্মাণের চেষ্টা করছি, যেগুলো নজরুল-সাহিত্য পড়ার ক্ষেত্রে জুতসই বিবেচিত হতে পারে। এটি কোনো নতুন নন্দনতত্ত্বের কাঠামো নয়, তবে নতুন নন্দনের আকাঙ্ক্ষা ও জরুরত এখানে প্রতিফলিত হয়েছে।

এক. নজরুল রাজনীতিপ্রবণ ও রাজনৈতিক। 'রাজনীতি' বলতে বুঝব ক্ষমতার লড়াই, পক্ষ-প্রতিপক্ষের সুস্পষ্ট ধারণা, আর সেই ধারণার অনুকূল সক্রিয়তা। অপরদিকে, রাজনৈতিকতা এক ধরনের চৈতন্য, যা ব্যাপ্ত থাকতে পারে সর্বত্র। ব্যক্তিগত বা সামষ্টিক জীবনচর্যার যে কোনো অংশই হয়ে উঠতে পারে রাজনৈতিক, যদি তা রাষ্ট্রক্ষমতা বা জনগোষ্ঠীর রূপ-রূপান্তরের ব্যাপারে সজাগ থাকে। এই সচেতনতা কেবল সক্রিয়তা আর উচ্চকণ্ঠ ভাষণে প্রকাশ পাবে এমন নয়, বরং শিল্পকলার উচ্চাভিলাষী সব পরীক্ষা-নিরীক্ষাও ব্যাখ্যাসূত্রে গণ্য হতে পারে রাজনৈতিক বলে। ওয়াল্টার বেঞ্জামিন যেভাবে চলচ্চিত্র পাঠ করেন (বেঞ্জামিন ২০০৭), তার মধ্যে রাজনৈতিক নন্দনতত্ত্বের উৎকৃষ্ট নমুনা দেখতে পাই। একইভাবে, আপাতদৃষ্টিতে অরাজনৈতিক লেখক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় উপনিবেশ-বিরোধী লড়াই-সংগ্রামের দারুণ আধার হয়ে ওঠেন পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়ের *উপন্যাস রাজনৈতিক : বিভূতিভূষণ* গ্রন্থে।

মার্কসবাদী সমালোচনার ধারায় নজরুলকে অনেকদূর পর্যন্ত কার্যকরভাবে পড়া যায়। সৃজনশীল চর্চার অভাবে একসময়ের বেগবান এই সমালোচনা-ধারা আজ আর ফলবান নেই। অন্তত প্রাতিষ্ঠানিক সমালোচনায় একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তার করে আছে 'আধুনিকতাবাদী' সাহিত্যতত্ত্ব, যে তত্ত্ব ঘোষিতভাবেই রাজনীতিবিমুখ। যদিও চল্লিশের মার্কসবাদী ধারার কবিতা এবং সাতচল্লিশ-উত্তর বাংলাদেশের কবিতার একটা বড় অংশ আধুনিকতাবাদী তত্ত্বে আদতে পাঠ করা সম্ভব নয়, তবু এক ধরনের মোহগ্রস্ততায় এবং সৃজনশক্তিহীন জড়তায় আমরা ধরে আছি ওই বহুচর্চিত — স্বয়ং পশ্চিমে বিলুপ্ত — সমালোচনা-তত্ত্ব। আমাদের এই 'ধরে থাকা' আর তিরিশি আধুনিকতার রাজনীতি-বিমুখতা — দুই-ই অবশ্য রাজনৈতিকভাবেই পাঠ করা উচিত। তাতে ধরা পড়বে মধ্যবিত্ত মানসিকতার উৎপত্তি ও বিকাশের সংকীর্ণতা, এবং হয়ত বা, আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতির দীনতাও।[৪]

দুই. ঔপনিবেশিক ও উত্তর-ঔপনিবেশিক তত্ত্ব সংগত কারণেই নজরুল-পাঠে বেশ কার্যকরি হওয়ার কথা। নজরুলকেন্দ্রিক বহু আলোচনায় অবশ্য উপনিবেশ-প্রসঙ্গ বেশ জোরালোভাবে হাজির আছে। কিন্তু, গত কয়েক দশকে বিশ্বব্যাপী ঔপনিবেশিক সম্পর্ক ও উপনিবেশ-বিরোধী লড়াই-সংগ্রামের তাত্ত্বিক চর্চা যেসব নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে, আমাদের সমালোচনা-সাহিত্যে তার ছোঁয়া আগে দেখা যায়নি। সাম্প্রতিক কয়েকটি রচনায় অংশত এ সব তত্ত্বের প্রতিফলন দেখি। (মাহমুদ ১৯৯৭, আইয়ুব ১৯৯৭, খান ২০০০, ২০০৩, ২০০৭, হোসেন ২০০৮)

আমাদের ভদ্রলোকি সাহিত্যের প্রচণ্ড ইউরোকেন্দ্রিকতার বিপরীতে নজরুল-সাহিত্যে পাই ব্যাপক এশীয়পনা। পারস্য, আরব, তুর্কি — এগুলোর পুনরাবৃত্ত উল্লেখ কেবল মুসলমানি ঐতিহ্যের সাথে যোগ নয়, অ-ইউরোপি প্রতিবেশীর প্রতি মনোযোগ দেয়াও বটে। প্রমাণ : মোঙ্গল-চিনা-জাপানিদের কথাও তাঁর রচনায় প্রচুর আছে। এটা মোটেই কাকতালীয় নয় যে, বহু বাঙালি কবির শ্বেতাঙ্গিনী-বন্দনার বিপরীতে নজরুলে পাই এশীয় রমণীর প্রতি মুগ্ধতা।[৫]

তিন. নজরুল-সাহিত্যের একটা বড় অংশ ব্যক্তিগত পাঠের বিষয় নয়, বরং সামষ্টিক ভোগ ও ব্যবহারের শিল্প। ব্যক্তিগত পাঠের সাহিত্য সাহিত্যের একটি ধরন মাত্র, এবং অবশ্যই প্রভাবশালী ও উপযোগী ধরন, যা বিকশিত হয়েছে শিল্পবিপ্লবোত্তর উৎপাদন-সম্পর্কের বিশেষ স্তরে। কিন্তু এর বাইরেও কবিতার আছে অসংখ্য ধরন, ব্যবহার ও উপযোগিতা — আছে মানুষকে জাগানোর দায়িত্ব, দশের কথা বলার ও শোনার দায়িত্ব, উৎসবাদি ও সামষ্টিক আয়োজনে ব্যবহৃত হবার বাস্তবতা। নজরুলের কবিতা সেই বাস্তবতার কবিতাও বটে। তিনি কাজ করেছেন সামষ্টিক মনস্তত্ত্ব নিয়ে, কবিতার উচ্চারণরীতিতে এনেছেন সেই বিশিষ্টতা, যার দৌলতে দশের কথা দশকে সহসাই স্পর্শ করে যায়। তাঁর কবিতা ও গানে যে কোরাসের প্রাবল্য, তা এই বাস্তবতার বাহ্য লক্ষণ মাত্র; আরো অসংখ্য আভ্যন্তর লক্ষণ থেকে দেখানো যাবে যে, তাঁর বহু রচনা 'ব্যক্তিগত সাহিত্যে'র নন্দনতত্ত্বের পরোয়া করে না।

চার. নজরুলের কবিতায় সংগীতধর্মের প্রাবল্যও বিশেষ মনোযোগের দাবিদার। তাঁর ধ্বনিময়তা, নিখুঁত অন্ত্যমিল আর সুরের সম্মোহন শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাথে কবিতার পুরানা সখ্যের কথাই মনে করিয়ে দেয়। ছাপাখানার আধিপত্যের মধ্যে শিল্পভোগের ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়ের যে রূপান্তর ঘটেছে, অর্থাৎ, শ্রুতির পরিবর্তে যেভাবে দৃষ্টির প্রাধান্য স্থাপিত হয়েছে, তার ইতিহাস মনে রাখলে পশ্চিমা কবিতায় চিত্রকল্পের প্রাধান্যের ব্যাপারটিও বোঝা যাবে, আর ভিন্ন আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে কান-নির্ভর কবিতার তাৎপর্যও আন্দাজ করা যাবে। তখন নজরুলের ধ্বনিক-সাংগীতিক পরিচর্যাকে 'পদ্য' হিসাবে চিহ্নিত করলেই কাজ শেষ হয়ে যাবে না, গভীরতর অন্য নন্দনসূত্রেও পরীক্ষা করে দেখতে হবে। আগের অনুচ্ছেদে আমরা ব্যক্তিগত সাহিত্যের বিপরীত যে বাস্তবতার কথা বলেছি, তার সাথে এই সাংগীতিকতার নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান।[৬]

পাঁচ. নজরুল এক বিশেষ অর্থে বাস্তববাদী কবি। বাস্তব ঘটনা নিয়ে কবিতা লিখেছেন বলেই নয়; বরং তাঁর দেখার প্রক্রিয়ার মধ্যেই বাস্তবতার এই বিশিষ্টতা সক্রিয় ছিল। তাঁর শাসনহীন ইন্দ্রিয়বৃত্তি, প্রগলভ প্রেম আর দার্শনিক আবেষ্টনীমুক্ত সৌন্দর্য ও প্রকৃতি-অনুধ্যান এই বাস্তবতারই বহিঃপ্রকাশ। কোনো পূর্বপরিকল্পিত দৃষ্টি নিয়ে তিনি চারপাশে তাকাননি। কল্যাণের অস্পষ্টভাবে নিরূপিত এক মূর্তি তাঁর মনে ছিল; সেটাই স্থির করে দিয়েছে তাঁর শত্রু-মিত্র। সেই অনিরূপিত মূর্তি থেকে তিনি অবরোহ পন্থায় নিচে নেমেছেন, আর মাটির পৃথিবীতে প্রাত্যহিক দিনযাপনের অভিজ্ঞতা থেকে উপাদান সংগ্রহ করে আরোহ পদ্ধতিতে উঠেছেন উপরে। এ কারণেই তাঁর কবিতা একেবারে মাটিতে থাকেনি, তবে সবসময় মাটির কাছাকাছি ছিল।

ছয়. নজরুল কতগুলো শব্দ তাঁর সৃষ্টিধর্ম ব্যাখ্যার জন্য ব্যবহার করেছেন — যেমন, সুন্দর, প্রেম, সৈনিকতা, বিদ্রোহ, বিপ্লব, যৌবন ইত্যাদি। ঠিক যুক্তি-বুদ্ধি-জ্ঞান — যাকে বলতে পারি র‍্যাশনালিটি — তাঁর বিবেচনায় কখনো প্রাধান্য পায়নি। বরং তাঁর অনেক লেখায় তিনি জ্ঞান-বুদ্ধি-শৃঙ্খলা-সংযমকে নিজের মতো করে কটাক্ষ করেছেন।

এই জীবনদৃষ্টি পশ্চিমা ধারণার সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। নজরুল কোনো প্রভাবশালী ডিসকোর্স মেনে চলেননি, নিয়েছেন কতগুলো 'ডিসকার্সিভ এলিমেন্ট', যেগুলো সমকালীন ও স্থানীয় বাস্তবতার প্রচণ্ড চাপে নতুনভাবে রূপায়িত হয়েছে। যেমন, তিনি স্বাধীনতা, বিপ্লব, যৌবন, মানুষ — এই ধারণাগুলো অনবরত ব্যবহার করেছেন। ধারণাগুলো পুরোপুরি অপশ্চিমা — এমন বলা যাবে না। কিন্তু সেগুলো পশ্চিমা ডিসকোর্সের আধিপত্যের মধ্যে, শৃঙ্খলা ও শিক্ষার সীমার মধ্যে রূপায়িত না হওয়ায় একটা নতুন রূপে হাজির হয়।

তত্ত্বের সাথে তত্ত্ব-ব্যবহারকারীর প্রায়ই দেখা যায় এক অধীনতামূলক সম্পর্ক; বিশেষত, তত্ত্বটি যদি হয় পশ্চিমা, আর ব্যবহারকারী যদি হয় উপনিবেশিত মনস্তত্ত্বের কেউ। একে বলতে পারি হেগেলীয় 'মনিব-দাস' সম্পর্কের বিশেষ প্রকাশ, যা নজরুলের ক্ষেত্রে প্রায় কখনো ঘটেনি। না ঘটাটা আবশ্যিকভাবে ভালো, তা বলা আমাদের লক্ষ্য নয়;

তবে নজরুলের সমগ্র সাহিত্যকর্মের খুব ভিতরের বিশিষ্টতা বুঝতে এই তথ্য আমাদের সাহায্য করবে। নজরুল-রচনার এই অন্যতম সারসত্য প্রকাশিত হয়েছে তাঁর নিজেরই এক অজরামর পঙ্‌ক্তিতে। পঙ্‌ক্তিটি হল : 'অসঙ্কোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস'। যে ভাষা-শৃঙ্খলে আমাদের জন্ম ও বেড়ে ওঠা, তাতেই আছে অসংখ্য নিয়ন্ত্রক কাঠামো — জ্ঞানের, শৃঙ্খলার, সংযমের, সভ্যতার। এগুলোই আমাদের সংকোচে বিহ্বল করে রাখে। আমরা এগুলোকেই নির্মাণ-পুনর্নির্মাণ করতে থাকি, কদাচ ভেঙে তৈরি করি নতুন কাঠামো। জন্মসূত্রে, শিক্ষাসূত্রে, জীবনযাপনসূত্রে, আর মনের বিশিষ্ট গড়নের কারণে নজরুল নিয়ন্ত্রক-কাঠামোগুলোর বাইরেই থেকেছেন। নিটশে গ্রিক চিন্তাচেতনার দ্বিধারার কথা বলেছিলেন (চক্রবর্তী ২০০১ : ৪২)। একটি হল অ্যাপোলোর নিয়ম এবং অন্যটি ডায়োনিসুসের নিয়ম। অ্যাপোলো প্রশান্তি, স্বচ্ছতা, পরিমিতি, যুক্তিনিষ্ঠা এবং গ্রিক ধ্রুপদী আদর্শের প্রতীক; অন্যদিকে ডায়োনিসুস হলেন আবেগধর্মিতা, আতিশয্য, নিয়ন্ত্রণাভাব ও প্রাণের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রতীক। এই দ্বৈরথ ব্যবহার করে বলতে পারি, নজরুল ডায়োনিসুসীয় জীবনবোধের বহিঃপ্রকাশ। তাই তাঁর পক্ষে সহসা এমন উচ্চারণ সম্ভব হয়েছিল, যা যুক্তিনিষ্ঠার সংযমে সম্ভব ছিল না।

৬

নজরুল 'বড় কবি' ছিলেন — এমন কোনো প্রস্তাব হাজির করা এই নিবন্ধের লক্ষ্য নয়। আমরা বরং বলতে চেয়েছি : 'বড় কবি'র ধারণাটিই ঐতিহাসিক-সাংস্কৃতিক নির্মিতির মামলা। নজরুলকে অতীতের কোনো মহাত্মা হিসাবে পাঠ করার অভিলাষও আমাদের নেই। বর্তমানের মূল্যায়ন আর ভবিষ্যতের পথনির্দেশের ক্ষেত্রে নজরুল যতটুকু কাজে লাগে তার পর্যালোচনাই আমাদের উদ্দেশ্য।

তাঁর রাজনৈতিক প্রকল্প বাংলার ইতিহাসে ফলপ্রসূ হয়নি। বিপ্লবী রাজনীতি থেকে শুরু করে আমূল স্বাধীনতার স্বপ্ন, আর এক ধরনের সর্বব্যাপ্ত গণতান্ত্রিক সমাজ গড়ার যে নিরন্তর সাধনা নজরুলের মধ্যে আমরা দেখি, সুভাষ বসুর পর আর কোনো বাঙালি রাজনীতিবিদের মধ্যে তার সমরূপতা দেখা যায় নাই। হিন্দু-মুসলমানের মিলনে একটি সংগ্রামী জনগোষ্ঠী গড়ে উঠবে — তাঁর এই স্বপ্নও বাস্তবের মুখ দেখেনি। ফলে জনগোষ্ঠী হিসাবে নজরুলকে ব্যবহার ও ভোগ করার পরিসর আমরা অনেকখানিই হারিয়েছি।

কিন্তু ইতিহাসের একটা মজা হল, এর শুরু ও শেষ চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত থাকে না। ঘুরে ঘুরে নতুন রূপে অতীত বর্তমানে এসে হাজির হয়। নতুন বিশ্বব্যবস্থায় নব্য-ঔপনিবেশিক বাস্তবতার আজকের দিনে আবার মূর্তিমান হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশ-বিরোধী লড়াই-সংগ্রাম। এশিয়া-আফ্রিকা-লাতিন আমেরিকার দেশে দেশে সেই সংগ্রামের তাজা অভিজ্ঞতা থেকে জন্ম নিচ্ছে শিল্প-সাহিত্য, নতুন তত্ত্ব (হোসেন ২০০৮)। নতুন এই পরিপ্রেক্ষিতে পুরানা অভিজ্ঞতা হিসাবে নজরুল যে অনেক বেশি দরকারি আর প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠবে, তা কোনো দ্বিধা না রেখেই বলা যায়।

টীকা

১. দেবেশ রায়ের পূর্বোক্ত থিসিস অনুসরণ করে এই আধুনিকতাকে বলতে পারি বাংলা সাহিত্যের তৃতীয় আধুনিকতা। দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে নানা ঐতিহাসিক কারণে একটা কার্যকর মৃত্তিকা-সংলগ্নতা ক্রিয়াশীল ছিল, যেখানে ইউরোপীয় আকারের মধ্যে ভারতীয় উপাদানগুলোর একটা জুতসই রূপান্তর ঘটছিল। কিন্তু তৃতীয় আধুনিকতায় বিশ্বজনীনতার নামে আদতে ইউরোকেন্দ্রিকতা চরমে পৌঁছে; আর জনবিচ্ছিন্নতা শৈল্পিক উৎকর্ষ হিসাবে স্বীকৃতি পায়।

২. এ প্রসঙ্গে বিপিন পালের মন্তব্য উদ্ধারযোগ্য : 'তাঁহার (নজরুল ইসলামের) কবিতার সঙ্গে পরিচিত হইয়া দেখিলাম — এ-তো কম নয়। এ খাঁটি মাটি হইতে উঠিয়াছে। আগেকার কবি যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা দোতলা প্রাসাদে থাকিয়া কবিতা লিখিতেন। রবীন্দ্রনাথ দোতলা হইতে নামেন নাই। .. .. জাতির প্রাণে লাঙ্গল আসিয়াছে, নূতন ডিমোক্রেট নজরুলের বীণার ঝঙ্কারে তাই পাই। (ইসলাম ১৩৯০ : ১২৮)

৩. সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্যে এ বাস্তবতার প্রতিফলন মেলে : 'Nazrul came from a peasant family and that was why he had such a quick appeal in the mass minds.' (ইসলাম ১৩৯০ : ২২২)

৪. মার্কসবাদী সমালোচনার ধারায় কোনো ব্যাপক নজরুল-পাঠ যে হয়ে ওঠেনি, তার এক কারণ সৃষ্টিশীলতার অভাব। খুব কাঠামোবদ্ধ পার্টিলাইন-মেনে-চলা সমালোচনার ধারায় নজরুল বোধগম্য কারণেই সংগতিপূর্ণ হয় না। অন্য কারণটি বোধ হয় খানিকটা সম্প্রদায়গত, আর বৃহদংশে সাংস্কৃতিক। আমরা উনিশ শতকে নবউদ্ভূত মধ্যবিত্তের যে পরিচয় আগে দিয়েছি, কলকাতার মার্কসবাদী চর্চার প্রধান পুরোহিতরা তা থেকে বেশি দূরবর্তী নন। ফলে তাঁদের সাথে নজরুলের একটা সাংস্কৃতিক পার্থক্য বোধ হয় ছিলই। বিষ্ণু দে যে নজরুল সম্পর্কে একেবারেই নীরব ছিলেন, তা এর এক প্রমাণ। অন্য উদাহরণটি আরো আকর্ষণীয় হবে। সুকান্ত ভট্টাচার্য কবিতার ভাবে-স্বভাবে, এমনকি বিপ্লবী চেতনায়ও নজরুল দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর কাব্যসমগ্রে এর কোনো স্বীকৃতি মেলে না।

৫. গভীরভাবে 'আধুনিকতাবাদী' হলেও জীবনানন্দ দাশ তাঁর সমধর্মী কবিদের তুলনায় অন্য অনেক ব্যাপারের মতো এ ক্ষেত্রেও পৃথক। তাঁর রচনায় পশ্চিমের পাশাপাশি ব্যাপক পূর্বদেশীয় উল্লেখ আমাদের নজর এড়ায় না।

৬. এখানে উল্লেখ করা জরুরি যে নজরুলের বিবৃতি ও বর্ণনাধর্মী কাব্য পুরানা বাংলার কাব্যিক কথকতার সাথে নানাভাবে সম্পর্কিত। এর মানে অবশ্য এই নয় যে, উপনিবেশ-পূর্ব কাব্যধারা নজরুলের হাতে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোনো রূপ পেয়েছে, বা নজরুল উপনিবেশজনিত ছেদকে অতিক্রম করে গেছেন। নজরুলের কবিতায় বাংলার দার্শনিক কবিতার ধারা (যেমন, বৈষ্ণব জীবনীসাহিত্য বা লালনগীতি) খুব সামান্যই ব্যবহৃত হয়েছে। আমরা এখানে কেবল একটি সত্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি যে, শিল্পবিপ্লব সংঘটিত হয়নি, এমন একটি সমাজে কবিতার শ্রুতিধর্মের বিশিষ্ট নন্দনতাত্ত্বিক ভূমিকা আছে। নজরুলের কবিতার গণগ্রাহ্যতার সাথে এ বৈশিষ্ট্য অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত।

বই ও প্রবন্ধের তালিকা

আইয়ুব, সালাহউদ্দীন ১৯৯৭ : *নজরুল-সাহিত্যের নন্দনতাত্ত্বিক বিচার*, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা।
কবির, হুমায়ুন ২০০২ : *বাংলার কাব্য*, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ঢাকাভ
খান, সলিমুল্লাহ ২০০০ : "নজরুল ইসলামের সাকার, আকার ও নিরাকার", প্রথম আলো, ঢাকা।
২০০৩ : "কাজী নজরুল ইসলামের অজ্ঞান", যুগান্তর, ২৯ আগস্ট ২০০৩
২০০৭ : "নজরুল ইসলাম ও মহাত্মা গান্ধী", প্রথম আলো, ২৫ মে, ২০০৭

চক্রবর্তী, সতীন্দ্রনাথ ২০০১ : "প্রসঙ্গ : নীটশে", নীৎশে, বীতশোক ভট্টাচার্য ও সুবল সামন্ত সম্পাদিত, এবং মুশায়েরা, কলকাতা।

চৌধুরী, নীরদচন্দ্র ১৪০৬ : *আত্মঘাতী বাঙালী*, নবম মুদ্রণ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা।

১৪০৮ : *বাঙালী জীবনে রমণী*, চতুর্দশ মুদ্রণ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা।

চ্যাটার্জি, পার্থ ১৯৯৩ : *Nationalist Thought And The Colonial World*, second impression, University of Minneasota Press, Minneapolis.

ছফা, আহমদ ২০০০ : "নজরুলের কাছে আমাদের ঋণ", *আহমদ ছফার প্রবন্ধ*, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা।

রায়, দেবেশ ১৯৯১ : *উপন্যাস নিয়ে*, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা।

নন্দী, আশীস ১৯৮৯ : *The Intimate Enemy*, second impression, Oxford University Press, Delhi.

বেঞ্জামিন, ওয়াল্টার ২০০৭ : *যান্ত্রিক পুনরুৎপাদনের যুগে শিল্পকলা*, অনুবাদ : জাকির হোসেন মজুমদার ও মোহাম্মদ আজম, যোগাযোগ, ৮ম সংখ্যা, ফাহমিদুল হক সম্পাদিত, ঢাকা।

মনিরুজ্জামান, মোহাম্মদ সম্পাদিত ১৯৯৯ : *নজরুল সমীক্ষণ*, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা।

মাহমুদ, মজিদ ১৯৯৭ : *নজরুল : তৃতীয় বিশ্বের মুখপাত্র*, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা।

ইসলাম, মুস্তাফা নূরউল ১৩৯০ : *সমকালে নজরুল ইসলাম*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা।

রহমান, আতাউর ১৯৯৩ : *নজরুল : ঔপনিবেশিক সমাজে সংগ্রামী কবি*, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা।

সৈয়দ, আবদুল মান্নান ১৯৭৭ : *নজরুল ইসলাম : কবি ও কবিতা*, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা।

সৈয়দ, আবদুল মান্নান ১৯৮৭ : *নজরুল ইসলাম : কালজ কালোত্তর*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

হোসেন, আজফার ২০০৮ : "আমাদের নজরুল ও গর্জে-ওঠা ত্রিমহাদেশীয় কাব্যতত্ত্ব", কালের খেয়া, দৈনিক সমকাল, ২৩ মে ২০০৮

হোসেন, আবুল ১৯৯৫ : "নজরুলের স্বরূপ সন্ধান : কবিতা", *নজরুল-জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন স্মারক-গ্রন্থ*, খোন্দকার শওকত হোসেন সম্পাদিত, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা।